নিজের কলমে রণেন রায়চৌধুরী

যে মানুষটির নাম ঋত্বিক ঘটক

রণেন রায়চৌধুরী

শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত প্রথম ঋত্বিক ট্রাস্টের অনুষ্ঠানের পর দিন আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় হেডিং ছিল "সহী নিদারুণ গো," এটি ছিল একটি পল্লীসঙ্গীত। যিনি গানটি গেয়েছিলেন সেদিন, তাঁর নাম শ্রীরণেন রায়চৌধুরী। ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা থেকে শুরু করে প্রায় সব ছবিতে গান গেয়েছিলেন—কি নেপথ্যে কি পর্দায়।

ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আমার পরিচয় আকস্মিকই হয়েছিল। একদিন আমি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি চিঠি পাই তাতে তিনি লিখেছিলেন যে তুমি যদি একটি ভাটিয়ালি গাও ওর ছবিতে তাহলে আমার মান রক্ষা হয়। আজকে ওদের music taking। তুমি আমার চিঠি নিয়ে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে চলে যাও।

আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দুপুর তিনটে। শীতকালের বেলা। সব ফাঁকা, একজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋত্বিক ঘটকের দেখা পাব? তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, তিনি music taking ঘরে। আমি সেই ঘরে গিয়ে দেখি উনি একমনে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম আসতে পারি? উনি বললেন আসুন।

আমি ঋত্বিক ঘটকের কাছে হেমাঙ্গদার চিঠি দিয়ে বললাম হেমাঙ্গদা আমাদের পাঠিয়েছেন। উনি আমাকে বসতে বললেন। আমি বললাম আমি বসব না। এখন কার্তিকের শেষ। গান যদি আমাকে গাওয়ান তাহলে আমাকে সন্ধের আগে ডেকে দেবেন, তা না হলে আমার গলাটা নষ্ট হয়ে যাবে, কাল আমার রেডিওর প্রোগ্রাম আছে। তারপর সে গিয়ে Control Room-এ গিয়ে বসে বলল "আপনি গান", আমি গান গাইলাম, যে গানটি নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাইবার কথা ছিল। তারপর শুনে বললেন 'হবে'। তারপর Radio তে যে গানটা আমার গাওয়ার কথা সে গানটা শুনতে চাইলেন। সেটা মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত, গানটা শোনার পরে বলেন এই গানটা আমি নেব, তারপর চৌকীর উপর বসিয়ে একটার পর একটা অনেক গান শুনলেন। আর প্রত্যেকটা গানের শেষে বলেন, এই গানটা আমি নেব। তারপর আস্তে আস্তে সময় হয়েছে, দেবব্রত বিশ্বাস এসেছেন, এ.টি কানন, তাঁর স্ত্রী মালবিকা কানন এসেছেন। হঠাৎ ঋত্বিকের খেয়াল হয়েছে আমি কিছু খাই নি। সঙ্গে সঙ্গে খাবার আনার ব্যবস্থা করলেন। এদিকে এ.টি কানন শুধু গারগেল করছেন আর রেওয়াজ করছেন। এই করতে করতে রাত্রি তিনটে। আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই ঋত্বিক ঘটকের ওপর দারুণ রাগ হয়েছিল, আমি বললাম, আমি যাচ্ছি। আমার আর গান গাওয়ার সখ নেই, গায়ে এমন শীতে একটি

আদ্দির পাঞ্জাবী। তখন ঋত্বিক আমাকে ওর জহরকোট খুলে পরিয়েছিলেন, এদিকে ফাঁকে ফাঁকে আমার গান শোনে আর তোষামোদ করার চেষ্টা করে। সেই সময় এ.টি কানন বললেন ঋত্বিককে, আমাকে দেখিয়ে—এই চেহারাটি কাজে লাগাবার চেষ্টা করুন। তারপর আমার প্রথম গানটা শেষ হোল, তারপরে আরও চারটে সুফি ও একটি ভাটিয়ালি গান শোনাই আর প্রত্যেকটা গানটা শেষ হওয়ার পর, বলে আহা শালা তো বেশ গায়। ঐ এক রাত্তিরের মধ্যে আমার ও ঋত্বিকের আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই, তুই থেকে শালা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তারপর একদিন আমার office-এ এসে আমাকে নিয়ে নিউ থিয়েটারে তোলে। সেখানে একটা পুকুর ছিল যেখানে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। সেখানে বসে আমাকে বলে 'আগমনীর একটা গান নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাওয়ার কথা কিন্তু...কিন্তু তুই যদি গান গেয়ে দিস?' তখন আমি ঋত্বিককে বললাম, নির্ম্মল এর সঙ্গে আমার একটা গভীর সম্পর্ক আছে, এখন যদি আমি ঐ গান গাই তাহলে ওর অর্থকড়ির দিকে হাত দেওয়া হয়। আমি পয়সার নেশায় গান গাই না। আমার কাছে ভাসান অর্থাৎ বিসর্জনের গান আছে সেটা আমি কাউকে তুলে দিতে পারি। ঐ গানটি গীতা ঘটককে দিয়ে পরে আমি গাওয়াই।

একবার তৃপ্তি মিত্র, পীযূষ গাঙ্গুলি এবং আমার আলোচনা চলাকালীন, তৃপ্তি বলেছিল ঋত্বিক ঘটক যা জানে তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জানে। কথাটা যে একবর্ণ মিথ্যে নয় সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তখন 'মেঘে ঢাকা তারা'র সুটিং চলছে। আমি প্রতিদিন office এর পর হাজির হোতাম এবং সেখানে চুপচাপ বসে থাকতে পারতাম না, গেলেই সবাই বলত একটা গান গা, তাও আবার সুফি সম্প্রদায় ভুক্ত। আমি ওই সময় একটা গান গাই—"তুমি তো অন্তরযামী আমায়ে করলা ফানা"। তখন সে প্রশ্ন রেখেছিল অন্য সকলের কাছে 'ফানা' কথাটির অর্থ কি? তখন তিনি বললেন 'ফানার' অর্থ—'কথাটি হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মের দশম দশা আর সুফি সম্প্রদায়ের ফানা অর্থ একই,' তারপর সে আমার কাছে যত সুফি সম্প্রদায়ের গান শুনল এবং তার ব্যাখ্যা করে দেখাল যে, বাউল তত্ত্ব ও সুফি তত্ত্ব একটা একই ভাব ধারনার মধ্যে হিন্দুর বাউল-মুসলমানের আউল মিলে মিশে রয়েছে। বুঝলাম যে, সে সব মিথোলজী পড়েছে। তারই প্রকাশ বর্তমানে, ওর বক্তব্যের মধ্যে। ঋত্বিক প্রতিটি বিষয় গভীর ভাবে জানার চেষ্টা করে। আর একটা ব্যপার তো আমার কাছে প্রায় সবসময় স্মৃতি হয়ে থাকবে, সেটা হোল যুক্তি তক্কো আর গপ্পো ছবির একটি outdoor সুটিং হয়েছিল আউট-ট্রাম ঘাটে। যাইহোক ওখানে গিয়ে আমরা একটা দারুণ অসুবিধার মধ্যে পড়ি, গিয়ে দেখি আমার পোষাক আনা হয়নি। এখন কি করব, এদিকে দিনের আলো কমে আসছে। তখন রাস্তায় একজন মুসলমান ভিখারীর গায়ে ওর পোষাক দেখে আমি ঋত্বিককে বলি, ঐ পোষাকটা হোলে আমার চলে যাবে। ঋত্বিক শোনামাত্রই অনেক বুঝিয়ে ঐ ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিয়ে ওর পোষাকটা সংগ্রহ করে আমার জন্য। ঐ মুসলমানের নিকা টুপি, লুঙ্গি পড়ে যখন ক্যামেরার সামনে প্রস্তুত, হঠাৎ ঋত্বিক আমার যে গানটা গাওয়াব কথা, সেই গানটা কয়েকবার শোনার পর আমাকে সোজা ওখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। "চল শালা"। এদিকে সবাই বলছে রণেনের সট্ টা হয়ে যাক। কে কার কথা শোনে, একেবারে সোজা নিয়ে গিয়ে চাইনিজ রেস্তরাঁয় ওঠে, তারপর পর বলে হুইস্কি না জিন। আমি বললাম জিন্, ও নিজে হুইস্কির অর্ডার

দিয়ে আমাকে বোঝাতে লাগল। দ্যাখ তুই যে গানটা গাইছিস, সেটা হচ্ছে না, তুই ঐ গানটা আস্তে একবার গা। আমি তখন সেই গানটি "ছাইলা মাইয়ার কান্দন শুইনা, কান্দে পাগল দুরবীনসা" করলাম—সঙ্গে সঙ্গে ও বলে 'দুরবীনসা' কথাটির ঐ জায়গায়, গলায় একটা এফেক্ট সুর টান। আমি বললাম কেন? ও তখন বলে এই ছবি ওপার বাংলায় প্রদর্শিত হবে, ঐ শালারা এখনও ধর্ম কথা কয়। শালারা বোঝে না...তুই ঐ জায়গাটা (দুরবীনসা) একটা টান দিবি। তারপর আউটট্রাম ঘাটে আসতে আসতে অন্ধকার নেমে আসে, তখনকার মত সুটিং বন্ধ। অন্য দিন আমার জায়গাটা তোলা হয় তবে ঐ পোষাকে নয়। কারণ সেটাও হারিয়ে গিয়েছিল। আমি এইসব স্মৃতি টেনে আনলাম শুধু বোঝাতে চেয়েছি, ঋত্বিকের পল্লী সংগীতের প্রতি জ্ঞানের পরিধি কতটা বিস্তারিত ছিল।

আজ ঋত্বিককে নিয়ে 'ঋত্বিক ট্রাস্ট' হয়েছে, ওর ছবি বিভিন্ন সিনে ক্লাবের মাধ্যমে দেখান হয়েছে, ভাবতেও ভাল লাগে, কিন্তু আমি মনে করি ব্যাপক ভাবে এই সব করার জন্য বর্তমানে তরুণরা এগিয়ে আসুক। মূল্যায়ন হোক সঠিক ভাবে। যেটা জীবদ্দশায় কখনো হয়নি। আজ কাল প্রায়ই ঋত্বিকের বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়। কিন্তু যে সুস্থ চলচ্চিত্রের অগ্রণী পথিকৃত, তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে Intalect [?] বক্তব্য পেশ করি। আসলে আমরা বর্তমান সিনে ক্লাব-এর মাধ্যমে, বেশ কিছু বিদেশী film– দেখে, ঐ রকম একটি ধারণার সৃষ্টি করেছি। কিন্তু নিজে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করি না, এটা তো কিছু বুঝলাম না? কারণ আমরা তো intellectual। আমাদের ভারতবর্ষে Star System ব্যাপক, বিদেশে সে তুলনায় কম। তাই Star System-এর বাইরে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

অনেক সময় ঋত্বিকের বাড়িতে ছুটির আড্ডা বসত, হরেক রকমের লোক আসত। Film সমালোচক থেকে আরম্ভ করে সবাই। Freely আলোচনা হোত, বিজ্ঞের মত সমালোচনা করলে ক্ষেপে যেত। তখন সবাই মনে করত ঋত্বিক বড় দাম্ভিক, কিন্তু যারা কাছ থেকে মনের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করেছে তারা জানে অত্যন্ত সহজ সরল। যার শিল্পবোধ আছে তার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় বসতে কখনো দ্বিধা করতেন না।

একটা জিনিষ আমার খুব ভাল লাগত, ঋত্বিক কখনও বিবেক বিসর্জন দেয় নি। ঋত্বিক প্রায়ই বলতো যে 'সিনেমার চেয়ে যদি আরো কোনো সহজ মাধ্যম থাকে, আমি ফিল্মকে লাথি মেরে দিয়ে ঐ মাধ্যমে কাজ করব।' বাংলা দেশের চল্লিশ দশকের সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম একজন ঋত্বিক ঘটক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সমস্ত সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের জীবন শেষ করে সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হোয়ে। সেইরকম আর একজন ব্যক্তি শ্রীবিজন ভট্টাচার্য, যিনি সারাজীবন গ্রামের গরীব মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের নিয়ে নাটক লিখে গেছেন। চল্লিশ দশকের নাট্য জগতে তাঁর লেখা নাটক 'নবান্ন' এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। নাট্য ইতিহাসে আমার নেশা হোল গান গাওয়া, তাইত আমি তাদের উদ্দেশে গান সাজিয়েছিলাম, "পিরিতির পাকে পরে ভবা গোষ্ট কেঁদে মরে, জীবন ভোর গান গাইল কেউ তো আর শুনল ন," কিন্তু তারাই গ্রাম, মানুষ সবাইকে ভালবেসেছিল।

আজ ঋত্বিক নেই কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেদনাময়।